কৈশোরে দেখা কলকাতা একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে—সুধীর

কথা কলকাতা

সুধীর চক্রবর্তী

(লেখক, বাউল-বাংলা বিশেষজ্ঞ)

কলকাতায় যারা নিত্যদিন থাকে তাদের চোখে কলকাতার অন্য একটা মুখ কেন যেন ধরা পড়ে না। আমার মতো মানুষ যারা শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত কলকাতায় যাতায়াতে স্বচ্ছল তাদের চোখে অনেক কিছু চোখে পড়ে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে অন্যতর আরও কোনো ভ্রাম্যমানের চোখে ভিন্নতর কোণে ছবি চোখে পড়ে না। বছর দশেকেরও আগে নদিয়া জেলার গোরভাঙা নামের এক গাঁয়ে নিয়ামত সেখ আমাকে বলেছিল, একবার কলকাতায় গিয়েলম। সেখানে মানুষের কত কষ্ট আর হেনস্থা চোখে দেখে এসেছি।

কথাটা শুনে নড়েচড়ে বসলাম। কলকাতার লোকজন তাদের শহর নিয়ে খুবই গর্বিত সে তো জানি। শত সমস্যায় জর্জরিত, জ্যামজট, পরিবহন সমস্যা, বন্ধ,

আন্দোলন, বহুতল বাড়ির ফ্ল্যাটে গুপ্তহত্যা, মস্ত বাড়ি হঠাৎ ভেঙে পড়া, বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, সবই আছে কিন্তু তবু কিছুতেই কলকাতা প্রেম যাবার নয়। সবাই বলে, এত সুবিধে এত যোগাযোগ কোনো বড় শহরে নেই। শিল্প সংস্কৃতি সাহিত্যের ব্যাপারটা তো অনবদ্য, তারসঙ্গে কত পত্রপত্রিকা, লিটল ম্যাগ, গ্রুপ থিয়েটারের দল, ফিল্ম ক্লাব, ব্যান্ডের দল, রাজনীতির খোলা মঞ্চ এমনকী যাত্রাপালার সুতিকাগার সবই এই চনমনে শহর ঘিরে। প্রতিবাদ সভা, বিক্ষোভ আর টিভিতে প্রতিদিনের আলোচনা বৈঠক কত কিছু নিয়ে হচ্ছে তা জানার জন্যে সারা বাংলা এমনকী প্রতিবেশী বাংলাদেশ মুখিয়ে আছে। আর সবচেয়ে পরাক্রম হল খবরের কাগজের। সংবাদ পত্রের প্রতিষ্ঠানগুলি প্রচুর পরিশ্রমে খবর পরিবেশন করছেন আর সেই সব কাগজ কাকভোরে পৌঁছে যাচ্ছে ঘরে ঘরে। ট্রেনবন্দী হয়ে বা ভ্যানে করে চলে যাচ্ছে গাঁয়ে গঞ্জে মফস্বলে। আশ্চর্য এই শহরে নিয়মিত চিত্র প্রদর্শনী হয় এবং বহু দর্শক তা দেখতে আসেন। মিউজিক কনফারেন্স আর নানা গানের আসর তো আছেই। তারসঙ্গে আজকাল যোগ হয়েছে গ্রন্থ প্রকাশ আর গানের সিডির উদ্বোধন উৎসব। নিক্কো পার্ক, নলবন বা চারদিক ছড়ানো কত বেড়ানোর জায়গা, লেকে রোয়িং ক্লাব নানা ধরনের পানশালা ও ক্লাব ও শহরের স্বস্তির জায়গা। আর সব কিছুকে টক্কর দিয়ে কলকাতা বইমেলা ও ফিল্‌ম্ ফেস্টিভ্যাল। সারাদেশ মুখিয়ে আছে কবে ওই সব হুল্লোরবাজিতে সামিল হওয়া যায়। ট্রেন ভর্তি যুবকরা ছুটছে কিংবা ট্রাকে চড়ে দলীয় পতাকা উড়িয়ে ফুটবল পাগলরা— সকলের লক্ষ্য ময়দান বা যুবভারতী। যাকে বলে একশো মজার জনপদ।

এহেন মানব সম্পদ ও গরিমাময় শহর দেখে কোথাকার কোন গোরভাঙ্গা গাঁয়ের নিয়ামত সেখ বলে কিনা এ শহরে মানুষের হেনস্থা সে চোখে দেখে এসেছে? তার কাছে জানতে চাই বিশদে। সে হেসে বলে, দেখলাম কী জানো? কত কত মানুষজন রাস্তার ধারে, যাকে নাকি আপনারা বলেন ফুটপাত, সেখানে কোনোরকমে বেঁচে আছে। সেখানেই রান্না করছে, সেখানেই বাচ্চা মানুষ করছে, কলের জলে চান আর বাসন মাজা্ কাপড় কাচা, ওই পথে বসেই আবার খাচ্ছে, কেউ কেউ শুয়েও আছে। ছিঃ মানুষের এমন কঠিনভাবে বেঁচে থাকা এত নোংরার মধ্যে থাকা আমরা ভাবতে পারি না।

শুনে একটু গুম মেরে যাই। অন্য কলকাতার এই চেহারা যেন আমাদের চোখেই পড়ে না। কিংবা বলা যায় চোখ সয়ে গেছে। একজন সরল অশিক্ষিত গ্রামবাসী যে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে চুরমার করে দিল কলকাতার গর্ব।

আমার চোখে গাঁথা আছে অবশ্য অন্য এক কলকাতার ছবি। অনেক খোঁজ করে সে কলকাতার হদ্দমুদ্দ আজ আর খুঁজে পাওয়া কঠিন। সে হল গত শতকের চল্লিশের

দশকের ব্যাপার। ঘোর ইংরেজ আমলের সময়। আমাদের তখন কৈশোর কাল। থাকি গঙ্গার ওপারে হাওড়ার শিবপুরে। তার লঞ্চঘাট বরাবর দাঁড়িয়ে চেয়ে চেয়ে দেখা প্রবাহিনী গঙ্গার মধ্যে যেন ধুলি ধোওয়া আবছা রঙে আঁকা হাওড়া ব্রিজ। তার পাশে সামনাসামনি আর্মেনিয়ান ঘাট আর চাঁদপাল ঘাট, তার ফাঁকে ফাঁকে প্রাসাদ নগরীর অপরূপ দৃশ্য। লঞ্চ চেপে বাবার সঙ্গে কলকাতা পৌঁছে দেখা যেত হাইকোর্টের পাশে ইডেন গার্ডেনস। কি তার শ্যামল রূপ, আর অপরূপ সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত কাঠের তৈরি বঙ্গ প্যাগোডা। তখন তো আকাশবাণী ভবন তৈরি হয়নি। সবদিকে ফাঁকা আর ময়দানে নানা ক্লাবের তাঁবু। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে হোয়াইট ওয়ে লিডল বিল্ডিং সুউচ্চ মহিমায়। তার পাশে পরপর গ্র্যান্ড হোটেল আর মিউজিয়াম তার গায়ে কলকাতার বিখ্যাত আর্ট কলেজ। ঝকঝকে তকতকে পিচের রাস্তা। সবুজ গড়ের মাঠ আর তার মাঝখানে গোরা সৈন্যরা ব্যান্ড বাজাচ্ছে। ঘড়ি মিলিয়ে ঠিক একটা বাজলে একটা তোপ পড়ত। নিউ মার্কেটে সাজানো দোকান। রাস্তায় শৌখিন নরনারী। বেশ কয়েকজন সাহেব আর মেম হাঁটছে, তাদের চলনবলন একেবারে অন্য ধাঁচের। ভিড়ভাট্টা, কোলাহল, বাস টার্মিনাস আর পথচারীদের হট্টগোল একেবারে নেই। সুদীর্ঘ উচ্চতা নিয়ে মহিমান্বিত মনুমেন্ট। তার পাদদেশ একেবারে ফাঁকা। বাবা আমাদের কমলালেবু আর চকোলেট খাইয়ে নিয়ে যেতেন তাঁর এ.সি. মেথল অফিসের চার তলা বিল্ডিংয়ে। লিফটে চড়ে তার ছাদে উঠে দেখা যেত পুরো কলকাতা। জি.পি.ও. বাড়ি, রাইটার্স বিল্ডিংস, একটা চার্চ আর কতসব সৌধ। একদিকে ছিল গার্স্টিন প্লেসে অল ইন্ডিয়া রেডিও কলকাতার কেন্দ্র। অন্যধারে সুবিশাল গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল আর সম্ভবত গভর্নরস হাউস যাকে এখন বলে রাজভবন। রাস্তা ধরে পাতা আছে ট্রাম লাইন, চলছে শান্ত গতিতে ট্রাম। কোনো লরি বা ট্রাকের হুজ্জোৎ নেই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফুটপাথ ধীরে ধীরে মুটে পথচারীরা চলছে, কোনো ধাক্কাধাক্কি নেই। চলছে অনায়াস সাইকেলচারীরা। একটাও মোটর সাইকেল নেই, তবে বেবি ট্যাক্সি আছে, আছে ছোটমাপের কয়েকটা বাস।

কৈশোরে দেখা এই কলকাতা কতটাই পাল্টে গেল আমাদের উচ্চতর ছাত্র জীবনে। সেটা হল পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি। থাকতাম ওয়েলিংটন স্কোয়ারের হস্টেলে, পড়তাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। গোলদিঘির ধারে একটাও দোকান নেই, একপাশে সংস্কৃত কলেজ আর হিন্দুস্কুল। সামনের রাস্তা পেরোলেই প্রেসিডেন্সি কলেজ, হেয়ার স্কুল আর ইউনিভার্সিটির সেনেট হল যার স্থাপত্য হল গ্রেকো রোমান শৈলির। তারপাশে পরপর আশুতোষ ও দ্বারভাঙা বিল্ডিংস, তার পেছনে কলুটোলা ধরে ল'কলেজ। প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে দাশগুপ্ত কোম্পানি আর চক্রবর্তী চ্যাটার্জির

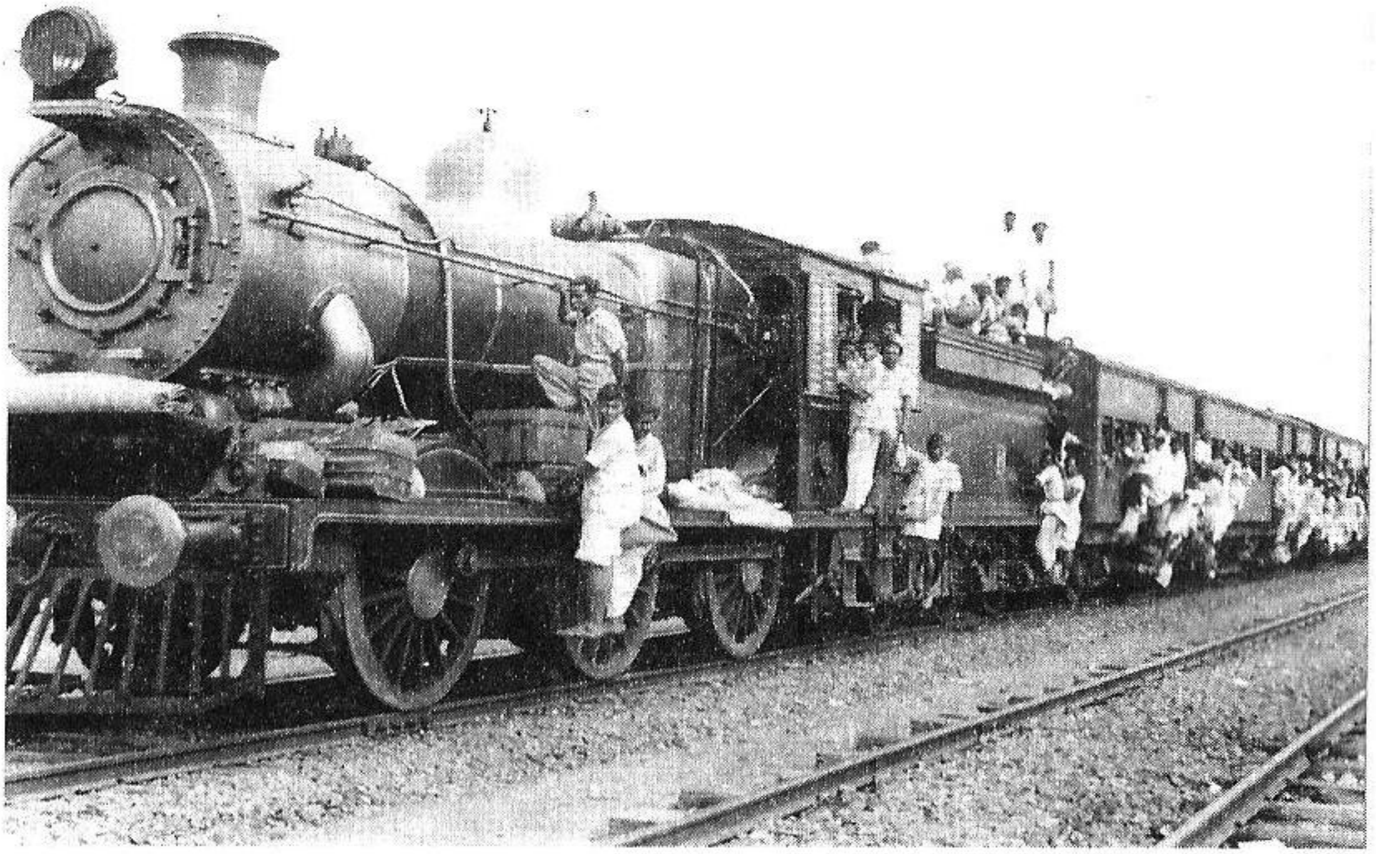

কলকাতায় ধেয়ে এল উদ্বাস্তু স্রোত। বদলে গেল শহরের চেহারা চরিত্র।

বইয়ের দোকান। তার পেছনে অ্যালবার্ট হলে কফি হাউস। তার গায়ে গায়ে বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট আর শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটে ছিমছাম বেশ কটি বইয়ের দোকান। যার মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন হল সিগনেট বুক সপ। আর সবচেয়ে জমজমাট হল এস.সি.সরকার, বেলল পাবলিশার্স আর মিত্র ও ঘোষ। এম.সি. সরকার আর মিত্র ও ঘোষের দোকান বিকেলবেলা থেকে জমজমাট হয়ে থাকত কবি সাহিত্যিকদের সান্নিধ্যে। আমরা উঁকি মেরে দেখতে পেতাম রাজশেখর বসু, বুদ্ধদেব বসু, সুধীরচন্দ্র সরকার, বিশু মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর, কালিদাস রায়, প্রমথনাথ বিশী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়রা বসে আড্ডা মারছেন বা মুড়ি তেলেভাজা খাচ্ছেন। সে কলকাতা এখন আর কই? চারপাশে গিজগিজ থিক থিক করছে বই আর মাছির মতো ক্রেতা বিক্রেতা। রাস্তা দিয়ে এখন হাঁটার জো নেই।

কলকাতা ছিল সৌন্দর্যের লীলা নিকেতন আর মধ্যবিত্তদের জীবনযাপনের পক্ষে আদর্শ পরিসর। এখানে বিদ্বানদের সম্মান ছিল, শিল্পী, সাহিত্যিক, সংগীতকারদের ছিল সাধনক্ষেত্র। শহরের মুখ ঢাকেনি বিজ্ঞাপনে, চারিদিকে এক ঝাঁ চকচকে আলো ঝলকিত বিপনি শ্রেণি আর এত বড়লোকিআনার চাল ছিল না। স্কুল কলেজে লেখাপড়ার একটা মান ছিল। এত সব ইংলিশ মিডিয়ামের দাপট ছিল না। এত গাড়ি এত বিলাসিতা এত শপিং মল এত নার্সিংহোম এত টিউশানি পড়া এত

যন্ত্রায়ণ ছিল না। কলকাতা তখন এত গায়েগতরে বেড়ে যায়নি। পাতাল রেল বা চক্ররেল কিংবা ফ্লাইওভার কোথায় সেই কলকাতার চত্বরে?

অথচ আমি পঞ্চাশ ষাটের দশকে সৃষ্টির কত বিভঙ্গ দেখে নিজেকে গড়েছি। কাঞ্চনমূল্যে তখন কোনো কৌলীন্য নির্ণয় হত না। বেতার জগতের নেপথ্যে যাঁরা নিজেকে আড়ালে রেখে দিতেন অসামান্য নাটক আর গানের সম্ভার তাঁরা আজ কোথায়? সাদাকালো সিনেমায় বানানো সেটে আশ্চর্য সব শিল্প বা অত্যুচ্চ প্রতিভার সেইসব অভিনেতা কই? সাধারণ মানের ধুতি পাঞ্জাবি পরা সেই সব কম বেতনের আদর্শবাদী শিক্ষক অধ্যাপকরাই বা আর নেই কেন? নাসিরুদ্দিন রোডের ছোট্ট ঘরে শম্ভু মিত্র যে চমকপ্রদ নাট্যভাবনা গড়ে তুলতেন, কিংবা কফিহাউসে বসে উৎপল দত্ত যে থিয়েটারের বনেদ গড়েছিলেন তার পুনরাবির্ভাব কি আর সম্ভব? উদয়শংকর, সত্যজিৎ, ঋত্বিক, তপন সিংহ, যামিনী রায়, শিশির কুমার, অজিতেশ, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বসু, দেবব্রত, সলিল, উত্তমকুমার, হেমন্ত, সন্ধ্যা তো এই শহর থেকেই উঠে আসা।

সবাই ভাববেন স্মৃতিকাতর এই লেখনী কি তবে কি বিয়োগপঞ্জি বানাতে চায় শুধু? গাইতে চায় শুধু হারানো সুরের গান? তা কেন? আমিই তো দেখেছি বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার, আমরাই তো দেখছি সৌমিত্রের কিং লিয়ার। এ শহরেই যে গড়ে উঠেছে দুর্বার মহিলা সমিতি। এখান থেকেই পত্তন হল মানবাধিকারের সংগ্রাম আর তথ্য জানার অধিকার নিয়ে সংগঠন। এখানকার মানুষই তো স্মরণকালের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াতে দেয়নি। সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রালের ঘণ্টাধ্বনি শোনা তো এ শহরের মধুর অভ্যাস। এ শহর টিকিট কেটে দেখে হিন্দি নাটক। নাটকের উৎসবে ডেকে আনে অন্য রাজ্যের নাট্যদলকে। হাবিব তানবীর, রতন থিয়াম আর তিজনবাইকে এ শহরই তো সমাদর করেছে। বাংলাদেশের লেখক লেখিকাদেরও এই কলকাতা সাহিত্য পুরস্কার দিতে পারে। রবীন্দ্রসংগীতের সবচেয়ে মান্যতা প্রচার ও শিক্ষাকেন্দ্র এখানেই। একমাত্র এ শহরেই জোরসোরে হতে পারে লিটল ম্যাগাজিন মেলা। শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে আসে তুলনামূলক সাহিত্য, ফিল্ম স্ট্যাডিজ ও উইমেন স্টাডিজ। আই টি সেক্টরে উদয়াস্ত ব্যস্ত তরুণ তরুণীরা, অজস্র টি ভি চ্যানেলে তারুণ্যের যেন উৎসব, তারই মধ্যে হয়তো দেখা যাবে কেউ কেউ নিজের পকেট থেকে টাকা বের করে পড়াচ্ছেন পথশিশুদের, যৌনকর্মীদের সন্তানদের জন্য খুলছেন কেউ কেউ পুনর্বাসন কেন্দ্র। শহরের বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ছুটে আসছে সবচেয়ে আগে নিম্নবর্গের ও সর্বনিম্ন আয়ের মানুষজন। শহরটা সবসময়ে জেগে আছে।

১৯৪৫-এর কলকাতার একখণ্ড জীবন

একটা সময়ে যেমন দর্জিপাড়ায় বাস করেছি, তেমনই ছিলাম হ্যারিসন রোডের বোর্ডিং হাউসে। এক সময়ে চিন্তামনি দাস লেনের একটা ঘরে থাকতাম। কালীঘাট অঞ্চলে একটা টিউটোরিয়াল হোমে একদা ছিল আমার ডেরা। আত্মীয় বর্গের বসবাসের সূত্র থেকেই অশ্বিনী দত্ত রোডে ও লেক গার্ডেনসে। এখন ফ্ল্যাট কিনেছি দমদমের নাগের বাজারের কাছে কাজিপাড়ায়। কাকাদের বাসা ছিল বরানগরে। এক সময়ে অধ্যাপনা করেছি বঁড়শে বেহালায় আর পরে যাদবপুরে। চারদিকে ছড়ানো এই শহরের কত যে মুখশ্রী আমার দেখা হল আর কত রকমের মানুষের সূত্রে জানলাম বেঁচে থাকার উদ্দীপনা কতখানি গাঢ় ও রঙিন। আশ্চর্য যে মস্ত দুটি কালীক্ষেত্র এ শহরেই বা শহরঘেঁষা জনপদে— কালীঘাট ও দক্ষিণেশ্বর। ঠনঠনিয়া বা বউবাজারের ফিরিঙ্গি কালীই বা কম কি? ওদিকে চিৎপুর রোডে নাখোদা মসজিদ ঘিরে ইসলামি সংস্কৃতির চমৎকার বাতাবরণ। অন্যদিকে পার্ক সার্কাসে বনেদি খানদান। লেক মার্কেটের আশেপাশে দক্ষিণ ভারতীয়দের রমরমা যেমন তেমনই ভবানীপুর ব্যেপে শিখ সম্প্রদায়।

এককালে দেখেছি রয়েড স্ট্রিট এলিয়ট রোড অঞ্চলে থাকত অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা। এখন তারা হাতে গোনা। যেমন ওয়েলিংটন স্ট্রিটে লোহার ব্যবসায়ে থাকত প্রচুর ওড়িয়া শ্রমিক। বউবাজারে হিদারাম ব্যানার্জি লেনে ওদিকে মলঙ্গা লেনে বা অক্রুর দত্ত লেনে থাকত কত মধ্যবিত্ত বাঙালি। এ সবই আমার হেঁটে হেঁটে দেখা। তবে সবচেয়ে আশ্চর্য দৃশ্য দেখেছি শশিভূষণ দে স্ট্রিটে পাড়ার মধ্যে এক জগন্নাথের মন্দিরে। প্রত্যেকদিন বিকেল চারটে নাগাদ দুজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়ে সেই জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা মূর্তিকে নববেশে সজ্জিত করে ভক্তদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। অজস্র জনচলাচল গাড়িঘোড়া হেঁটে কোলাহলের মধ্যে বেশ একটা নিরালা অনুষ্ঠান দাঁড়িয়ে দেখবার মতো।

ব্যতিক্রমী মানুষ সবসময়েই কলকাতায় থাকে। মোহন লাল স্ট্রিটে দেখা যাবে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যকে। চোখ দুটি ক্ষীণ কিন্তু সর্বদা মশগুল হয়ে আছেন পুঁথিপত্রে। আগে যেমন দেখতাম শ্যামপুকুর স্ট্রিটে সুনীল চট্টোপাধ্যায় সারাবছর ধরে ঘাটাঘুটি করছেন শেকসপিয়ারের নাটক নিখুঁতভাবে অনুবাদের কাজে। এখন তেমনই চোখে পড়বে বইপাড়ার একটা ম্যাগাজিন স্টলে বছরের পর বছর ধরে প্রতিমাসে বই বিষয়ে আগ্রহী করবার জন্য একটা করে রঙিন পোস্টার নিজের খরচে লিখে এঁকে টাঙিয়ে দিচ্ছে রমাপ্রসাদ দত্ত। দেখে মনে পড়ে লেবুতলা পার্কের পাশে একটা ব্ল্যাকবোর্ডে রোজ বিকেলে একজন ব্যক্তি একটা করে ছড়া লিখে রাখতেন। সবাই পড়ত। যেমন এখনও একটা বিখ্যাত নাট্যদল বাচ্চা ছেলেমেয়েদের নাটক অভিনয় দেখাচ্ছে। দৃষ্টিহীনদের নিয়ে নাটক তৈরি করে দেখানো কেউ কেউ কর্তব্য বলে মনে করেন। অলকানন্দা রায় জেলখানায় ঢুকে বন্দীদের শিখিয়ে পড়িয়ে অভিনয় করিয়ে ফিরিয়ে আনছেন অপরাধ জগতের বাইরে জীবনের মূল স্রোতে। এমন উদ্বৃত্ত জীবনীশক্তিই তো বড় শহরের প্রাণ।

এ সবের মধ্যে আমার চোখে ভাসে সুবল মাইতি আর গণেশচন্দ্র দাসের দিনযাপনের ছবি। তাদের ডেরা কেশব সেন স্ট্রিটের একটা প্রেস কাম বুক বাইন্ডিংয়ের ছোট্ট ঘরে। এসেছে মেদিনীপুরের গ্রাম থেকে এই মহানগরে। সারাদিন ধরে ঘুপচি ঘরে বসে প্রেসের ট্রেডল মেসিন চালায় আর তার ফাঁকে বই বাঁধায়। প্রিয় পরিজন থেকে দূরে, তাদের একটা থাকার জায়গাও নেই। অপরিসর সেই ঘরে মেসিন পত্রের সামান্য একটু ফাঁকে স্টোভ জ্বেলে নিরামিষ ঝোল ভাত বা ডিমের ডালনা ভাত রান্না করে খেয়ে পাশের ফুটপাতের কল থেকে ধুয়ে এনে রাখা। সেখানেই স্নান। গলির মধ্যে একটা এজমালি পায়খানা ব্যবহার আর ওই এক টুকরো ঘুপচি ঘরেই একটা বিছানা পেতে দুজনে শোওয়া। এটাও কলকাতার একটা চেহারা। অভিযোগহীন আর নিরুপায়।